

# শিক্ষার বিকিরণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশ কালঃ ১৯৩৩

**Published by**

[porua.org](http://porua.org)

## শিক্ষার বিকিরণ

ভোজ্য জিনিষে ভাণ্ডার উঠল ভরে, রান্নাঘরে হাঁড়ি চড়েচে, তবু ভোজ বলে না তাকে। আঙিনায় পাত পড়ল কত, ডাকা হয়েছে কত জনকে সেই হিসাবেই ভোজের মর্যাদা। আমরা যে-এডুকেশন শব্দটা আবৃত্তি করে মনে মনে খুসি-খাকি সেটাতে ভাঁড়ার ঘরের চেহারা আছে কিন্তু বাইরে তাকিয়ে দেখি ধূ ধূ করচে আঙিনা। শিক্ষার আলোর জন্যে উঁচু লঠন ঝোলানো হয়েছে ইস্কুলে কলেজে, কিন্তু সেটা যদি রুদ্ধ দেয়ালে বন্দী আলোক হয় তাহলে বলব আমাদের অদৃষ্ট মন্দ। সমস্ত পটজোড়া ভূমিকার মধ্যেই ছবির প্রকাশ, তেমনি পরিস্ফুটতা পাবার জন্যে শিক্ষা চায় দেশজোড়া ভূমিকা। ব্যাপক ভূমিকাদ্রষ্ট শিক্ষা কতই অস্পষ্ট অসম্পূর্ণ কেবল অভ্যাস বশতই তার দৈন্যের বেদনা আমাদের মন থেকে মরে গিয়েচে। এডুকেশন নিয়ে অন্য দেশের সঙ্গে স্বদেশের যখন তুলনা করি তখন দৃশ্য অংশটাই লক্ষ্য করি, অদৃশ্য অংশের হিসাব রাখিনে। মিলিয়ে দেখি যুনিভার্সিটি সেখানেও আছে, আমাদের দেশেও তার প্রতিরূপ দুটো একটা দেখা দিচ্ছে। ভুলে যাই এমন কোনো ভাগ্যবান দেশ নেই যেখানে বাঁধা শিক্ষালয়ের বাইরে সমস্ত সমাজজুড়ে আবাঁধা শিক্ষার একটা দিগন্ত বিকীর্ণ বৃহত্তর পরিধি না আছে।

এককালে আমাদের দেশেও ছিল। যুরোপের মধ্য যুগের মতো আমাদের দেশে শাস্ত্রিক শিক্ষাই ছিল প্রধান। এই শিক্ষার বিশেষ চর্চা টোলে চতুষ্পাঠীতে, কিন্তু সমস্ত দেশেই বিস্তীর্ণ ছিল বিদ্যার ভূমিকা। বিশিষ্ট জ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানের নিত্যই ছিল চলাচল। ওয়েসিস্-এর সঙ্গে মরুভূমির যে বৈপরীত্যের সম্বন্ধ, তেমন ছিল না পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্গে অপণ্ডিত লোকালয়ের। দেশে এমন অনাদৃত অংশ ছিল না যেখানে রামায়ণ মহাভারত পুরাণকথা ধর্মব্যাখ্যা নানা প্রণালী বেয়ে প্রতিনিয়ত ছড়িয়ে না পড়ত। এমন কি, যে সকল তত্ত্বজ্ঞান দর্শনশাস্ত্রে কঠোর অধ্যবসায়ে আলোচিত, তারো সেচন চলেছিল সর্বক্ষণ জনসাধারণের চিত্তভূমিতে। গাছের খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণ জল দিয়ে তরল হলে তবেই গাছ তাকে শাখায় প্রশাখায় গ্রহণ করতে পারে, তেমনি করেই সেদিন কঠিন বিদ্যাকে রসে বিগলিত করে সর্বজনের মনে সঞ্চারিত করা হয়েছে। যে সময়ে আমাদের দেশে পূর্তকর্ম ধর্মের অঙ্গ ছিল তখন গ্রামে গ্রামে জলাশয়ের আয়োজন স্বতই ছিল বিস্তৃত, সর্বজনে মিলে আপনিই আপনার তৃষ্ণার জল

জুগিয়েচে, রাজপরিষদের কোনো ব্যয়কুঠ আমলা-সেবস্তায় জলের জন্যে মাথা খুঁড়তে হয়নি। তেমনি করেই সমাজ দেশের বিদ্যা আপনাই দেশময় বিতরণ করেছে। না যদি করত তবে সমস্ত দেশ আজ বর্ষরতায় কালো কর্কশ হয়ে উঠত। বিদ্যা তখন বিদ্বানের সম্পত্তি ছিল না সে ছিল সমস্ত সমাজের সম্পদ।

যেখানে খবরের কাগজেরও পত্রমন্সর শোনা যায় না এমন একটি সামান্য গ্রামে চাষীরা একদিন আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল। সেখানে প্রায় সকলেই মুসলমান। আমার অভ্যর্থনা উপলক্ষ্যে চলছিল একটা গানের পালা। চাঁদোয়ার তলায় কেরোসিন লণ্ঠন জ্বলচে, মাটির উপর ছেলে বুড়ো সকলেই বসে আছে স্তব্ধ হয়ে। যাত্রাগানের প্রধান বিষয়টা গুরুশিষ্যের মধ্যে তত্ত্বালোচনা,—দেহতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব। থেকে থেকে তারি সঙ্গে নাচ গান কৌতুকের দ্রুতমুখরিত ঝঙ্কার। এই পালার একটি বিশেষ অংশ আজো আমার মনে আছে। কথাটা এই—যাত্রী প্রবেশ করতে চলেচে বৃন্দাবনে, পাহারাওয়ালা আটক করলে তার পথ, বললে, তুমি চোর, ভিতরে তোমাকে যেতে দেওয়া হবে না। যাত্রী বললে, সে কী কথা, কোথায় দেখলে আমার চোরাই মাল। দ্বারী বললে, ঐ যে তোমার কাপড়ের নীচে লুকোনো, ঐ যে তোমার আপনি, ওটা যোলো আনা আমার রাজার পাওনা, ফাঁকি দিয়ে রেখে নিজেরই জিম্মায়। এই বলতে বলতে মহা ঢাক ঢোল বেজে উঠল, চলল পরচুলো ঝাঁকানি দিয়ে ঘন ঘন নাচ। যেন ঐখানটা পাঠের প্রধান অংশ, অধ্যাপকমশায় পেন্সিলের মোটা দাগ ডবল করে টেনে দিলেন। রাত এগোতে লাগলো, দুপুর পেরিয়ে একটা বাজে, শ্রোতার শ্রি হয়ে বসে শুনচে। সব কথা স্পষ্ট বুঝুক বা না বুঝুক এমন একটা কিছু স্বাদ পাচ্ছে যেটা প্রতিদিনের নীরস তুচ্ছতা ভেদ করে পথ খুলে দিলে চিরন্তনের দিকে।

এমনি কতকাল চলেচে দেশে, বারবার বিচিত্র রসের যোগে লোকে শুনেচে ধ্রুব প্রহলাদের কথা, সীতার বনবাস, কণ্ঠের কবচদান, হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্বত্যাগ। তখন দুঃখ ছিল অনেক, অবিচার ছিল, জীবনযাত্রার অনিশ্চয়তা ছিল পদে পদে, কিন্তু সেই সঙ্গে এমন একটি শিক্ষার প্রবাহ ছিল যাতে করে ভাগ্যের বিমুখতার মধ্যে মানুষকে তার আন্তরিক সম্পদের অব্যাহত পথ দেখিয়েচে, মানুষের যে-শ্রেষ্ঠতাকে অবস্থার হীনতায় হেয় করতে পারে না তার পরিচয়কে উজ্জ্বল করেচ। আর যাই হোক, আমেরিকান টকির দ্বারা এ কাজটা হয় না।

অন্য সকল দেশে আবশ্যিক শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছে অল্পদিন হোলো। আমাদের দেশে যে-জনশিক্ষা তাকে আবশ্যিক বলব না, তাকে বলব স্বেচ্ছিক। সে অনেক কালের। তার পশ্চাতে কোনো আইন ছিল না, তাগিদ ছিল না, তার স্বতঃস্ফূর্ত ছিল ঘরে ঘরে যেমন রক্তচলাচল হয় সর্বদেহে।

তার পরে সময়ের পরিবর্তন হোলো। ইতিমধ্যে শিক্ষিত সমাজ যখন রাজদ্বারের দিকে মুখ ফিরিয়ে মন্ত্রিসভায় প্রবেশাধিকারের আবেদন কখন বা করণকণ্ঠে কখন বা কৃত্রিম আক্রোশে পেশ করছিলেন তখন তাঁদের পিছনের দিকে গ্রামে গ্রামে পিপাসার জল এলো পাঁকের কাছে নেমে, এদিকে সহরে সহরে দ্বারে দ্বারে ঝরতে লাগল কলের জল। আমরা বিস্মিত হয়ে বললেম, এ'কেই বলে উন্নতি। দেশের যেটা বৃহৎরূপ সেটা লুকোলো আমাদের অগোচরে, যে-প্রাণ যে-আলো দেশের সর্বত্র বিকীর্ণ ছিল সেটা প্রতिसংহত হোলো ছোটো ছোটো কেন্দ্রে।

একালে যাকে আমরা এডুকেশন বলি তার আরম্ভ সহরে। তার পিছনে ব্যবসা ও চাকরি চলেচে আনুযঙ্গিক হয়ে। এই বিদেশী শিক্ষাবিধি রেল-কামরার দীপের মতো। কামরাটা উজ্জ্বল, কিন্তু যে যোজন যোজন পথ গাড়ি চলেছে ছুটে সেটা অন্ধকারে লুপ্ত। কারখানার গাড়িটাই যেন সত্য, আর প্রাণবেদনার পূর্ণ সমস্ত দেশটাই যেন অবাস্তব।

সহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মন পেলে, অর্থ পেলে; তারাই হোলা এনলাইটেন্ড, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণগ্রহণ। ইঙ্কুলের বেঞ্চিতে বসে যাঁরা ইংরেজি পড়া মুখস্থ করলেন শিক্ষাদীপ্ত দৃষ্টির অন্ধতায় তাঁরা দেশ বলতে বুঝলেন শিক্ষিত সমাজ, ময়ূর বলতে বুঝলেন তার পেখমটা, হাতি বলতে তার গজদন্ত। সেইদিন থেকে জলকষ্ট বলো, পথকষ্ট বলো, রোগ বলো অজ্ঞান বলো জমে উঠল কাংস্যবাদ্যমন্ডিত নাট্যমঞ্চের নেপথ্যে নিরানন্দ নিরালোক গ্রামে গ্রামে। নগরী হোলো সুজলা সুফলা টানা পাখাশীতলা, সেইখানেই মাথা তুললে আরোগ্যনিকেতন, শিক্ষার প্রাসাদ। দেশের বুকে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এত বড়ো বিচ্ছেদের ছুরি আর কোনোদিন চালানো হয়নি, সে কথা মনে রাখতে হবে। এ'কে আধুনিকের লক্ষণ বলে নিন্দা করলে চলবে না। কেননা কোনো সভ্য দেশেরই অবস্থা এ রকম নয়। আধুনিকতা সেখানে সপ্তমীর চাঁদের মত অর্ধেক আলোয় অর্ধেক অন্ধকারে খণ্ডিত হয়ে নেই। জাপানে পাশ্চাত্য বিদ্যার সংশ্রব ভারতবর্ষের চেয়ে অল্পকালের, কিন্তু সেখানে সেটা তালিদেওয়া ছেঁড়া কাঁথা নয়। সেখানে পরিব্যাপ্ত বিদ্যার প্রভাবে সমস্ত দেশের মনে চিত্তা করবার শক্তি অবিচ্ছিন্ন সঞ্চারিত। এই চিত্তা এক ছাঁচে ঢালা নয়। আধুনিক কালেরই লক্ষণ অনুসারে এই চিত্তায় বৈচিত্র্য আছে অথচ ঐক্যও আছে, সেই ঐক্য যুক্তির ঐক্য।

কেউ কেউ তথ্য গণনা করে দেখিয়েচেন পূর্বকালে এ দেশে গ্রাম্য পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার যে উদ্যোগ ছিল ব্রিটিশ শাসনে ক্রমেই তা কমেছে। কিন্তু তার চেয়ে সর্ব্বনেশে ক্ষতি হয়েছে জনশিক্ষাবিধির সহজ পথগুলি লোপ পেয়ে আসাতে। শোনা যায়, একদিন বাংলা দেশ জুড়ে নানা শাখায় খাল কাটা হয়েছিল অতি আশ্চর্য্য নৈপুণ্যে—হাল আমলের অনাদরে এবং নিব্বুদ্ধিতায় সে সমস্তই বন্ধ হয়ে গেছে ব'লেই তাদের কূলে